মুকুন্দবাবু স্যার

সমর বসু

আজও চুঁচুড়া সোম ট্রেনিং একাডেমীর শিক্ষক। তবে এখন আর তিনি উঁচু ক্লাসে পড়ান না। আইনেরমার প্যাঁচে এতদিনের যোগ্য শিক্ষক আজ উঁচু ক্লাসে পড়ানোর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছেন অযোগ্য। তাই তাঁকে এখন পড়াতে দেওয়া হয় ক্লাস ফাইভে কি সিক্সে। বড়জোর ক্লাস সেভেনে। কোনো ক্রমেই তার ওপরে নয়।

স্কুলে পৌঁছে মুকুন্দবাবু স্যারের খোঁজে গেলাম টিচার্স মে। দেখলাম আমাদের আমলের অনেক শিক্ষকই আজ আর নেই। নবীনেরা এসে সে আসন দখল করেছেন। মাঝে তো প্রায় বছর দশেকের ব্যবধান। ইতিমধ্যে আমাদের সময়ের অনেক শিক্ষকই কাজের পালা শেষ করে স্কুল থেকে চিরছুটি নিয়েছেন। অনেকে আবার এই দুনিয়ার সব দেওয়া নেওয়া মিটিয়ে পরলোকের উদ্দেশো নিয়েছেন চিরবিদায়।

লক্ষ্য করলাম টিচার্সমের সেই ভাব গম্ভীর পরিবেশ আজ কালের চক্রান্তে উধাও। পরিবেশ আজ অনেক হাল্কা। কিছুটা চটুলও।

আমাদের আমলের হরিবিলাস বাবু আজ যেন সেই অতীতের ধবংসাবশেষ। ঘরের এককোণে নির্জীব হয়ে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। এক সময় তাঁর কেবল উপস্থিতিটুকু শুধু ছাত্র কেন স্কুলবাড়ীর মোটা মোটা উঁচু থামগুলোর ভিতরটা পর্যন্ত যেন কাঁপিয়ে তুলতো। আজ সেই হরিবিলাসবাবুর উপস্থিতিটা খসে পড়া সজনে পাতার মতো নিস্তব্ধ অবহেলিত এবং বোধহয় অতিরিক্তও।

দরজার গোড়ায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন নবীন শিক্ষক বেরিয়ে এলেন। আমাকে ভেবেছেন বোধহয় কোনো ছাত্রের অভিভাবক। বললেন -- কাউকে খুঁজছেন মনে হচ্ছে---

বললাম ---হ্যাঁ---মুকুন্দবাবু স্যারকে---

---ও - আচ্ছা ---আপনারই বোধহয় ভাইকে মারার সেই কেসটা---

ব্যপারটা বুঝতে পারলাম না। তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললাম --- বুঝলাম না তো---

উনি বললেন --- আমারই ভুল হয়েছে --- আমি ভেবেছি আপনি বোধহয় সিক্স বির রমেনের দাদা---ওর দাদার আজ আসার কথা আছে কিনা---

বুঝলাম ভদ্রলোক প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলেন। তবে এটা তাঁর দোষ নয়। স্বভাব ধর্ম। তাই ভাবলাম ব্যাপারটা জানতে কোনো অসুবিধা হবে না। কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে বললাম--- কি মারার কেস বললেন বুঝতে পারলাম না তো -----

আমার প্রশ্নটা অবান্তর। তা জেনেও ভদ্রলোক বললেন--- সেদিন রমেন টিফিনে সিগারেট খেয়েছিলো বলে মুকুন্দবাবু ওকে খুব মেরেছিলেন--- সে সময় ওর ঠোঁটের সামান্য একটু কেটে যায়--- তাই ওর দাদা হেডমাস্টারমশাইকে কমপ্লেন করেছেন---ডি. আই. কেও জানিয়েছেন ব্যাপারটা মিটমাটের জন্য হেডমাস্টারমশাই আজ তাঁকে আসতে অনুরোধ করেছেন---আমি ভাবলুম বোধহয় আপনি---

---না না - আমি অন্য দরকারে এসেছি---

---দাঁড়ান বলছি উনি কোথায়---

তারপর মুখখানা ভিতরদিকে ঘুরিয়ে একজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন---নীলমনি দেখতো---এম. সি. র কোন ক্লাস চলছে---

দেওয়ালে টাঙানো স্টাফ টিনটার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ---সিক্স -এর হিস্ট্রী ক্লাস---

উনি গলার স্বরে ইষৎ ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললেন---অর্থাৎ গঙ্গার ধারে পিয়ারা গাছতলায়---

নবীন শিক্ষকটি আমাকে স্থানটা বোঝাতে শু করলেন। ওঁকে মাঝপথে বাধা দিয়ে মৃদু হেসে বললাম---আমি জানি কোথায়--আমি যে এই স্কুলেরই এক্স স্টুডেন্ট--- মুকুন্দবাবুর কাছে পড়েছি---

---ও-তাই বুঝি

উনিও হাসলেন।

নমস্কার বিনিময় করে পিয়ারা গাছতলার দিকে এগোতে থাকলাম।

দূর থেকে দেখলাম ছোট ছোট ছেলেদের মাঝখানে বসে পড়াচ্ছেন মুকুন্দবাবু স্যার। তাঁর চেহারায় অনেক পরিবর্তনএসেছে। সে অঁ

াট সাঁট বাঁধন আজ বয়সের ভারে অনেকখানি আল্গা। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়া ভাব। অনেক রোগাও হয়ে গেছেন। চশমার কাঁচদুটো হয়েছে আগের চেয়েও মোটা।
ছেলেরা তন্ময় হয়ে শুনছে ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ের গল্প।
আমরাও একদিন ওভাবে বসে শুনতাম। ঐ পিয়ারাগাছ তলায় জীবনের কতো মধুময় স্মৃতির কণা মিশে আছে। ঐ স্থানটাকে ঘিরে একরাশ ছোট ছোট ঘটনার স্মৃতি আজ এ মুহূর্তে হঠাৎ এতোগুলো বছরের সাঁকো ডিঙ্গিয়ে মনের দুয়ারে হুড়মুড় করে এসে পড়লো। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠলো। সেই দিনগুলোর বিরহে যেন কেঁদে উঠলো মনটা। ভাবলাম আবার যদি জীবনের সেদিনগুলো ফিরে পেতাম।
ভাবছি ছাত্র মারার অপরাথে মুকুন্দবাবু স্যারকে আজ দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়।
মনে পড়লো মুকুন্দবাবু স্যারের জীবনে এমন একটা ঘটনার কথা। জানিনা ওঁর ঘটনাবহুল জীবনে সে ঘটনাটা আলাদা কোনো স্থান নিয়ে মনের পর্দায় ছাপ মেরে বসে আছে কিনা। কিন্তু আমার খুব ভালো মনে আছ।
তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। আমাদের সহপাঠী ছিলো তখনকার স্থানীয় এ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে। নামটা ভুলে গেছি। বোধহয়, কুন্তল হলে। কে জানে পৃথিবীর এই গোলক ধাঁধায় আজ সে কোথায় কি অবস্থায় আছে। পিতার সুনাম বজায় রাখতে পেরেছে কিনা তাও জানা নেই। তবে সে সম্ভাবনা কম। কেননা তেমন লক্ষণ তার জীবনের গোড়ায় কারও লক্ষ্যেই পড়েনি।
সেদিন সেই কুন্তল পণ্ডিতমশাইয়ের সংস্কৃত ক্লাসে পিছনের বেঞ্চে বসে কুকুর ছানার ডাক ডেকেছিল। তার পিতার পদমর্যাদার কথা ভেবে এবং নিজের মর্যাদাহানির আশঙ্কায় তার এরকম অত্যাচার মেনে নিতেন প্রায় সব শিক্ষকই।
কেবল মুকুন্দবাবু স্যারের পিরিয়ডে সে মানুষের মতো স্বাভাবিক আচরণ পালন করতো। তাছাড়া অন্যান্য শিক্ষকদের ক্লাসে সে বোধহয় ভুলে যেতো তার মনুষ্যসত্তার কথাটা। পিরিয়ডে পিরিয়ডে তার স্বরের বদল ঘটতো। কখনো বিড়াল, কখনো শিয়াল, আবার কখনো শিশুর কান্না। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ডাক ডেকে মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়া ক্লাসটাকে সরগরম করে হাসাতো সবাইকে। ওতে ও আনন্দ পেতো।
সেদিন কুকুরছানার নিখুঁত আর্তনাদ তুলে একবারে গোটা ক্লাসটাকে হাসিয়ে দিলো। যেন আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেঞ্চিগুলো পর্যন্ত হেসে উঠলো খিল খিল করে।
পণ্ডিতমশাই তখন এ পরিবেশকে উপেক্ষা করে তার স্বরে শব্দরূপ বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকলেন।
আমরা কেউ জানতাম না যে পার্টিশনের ওধারে মুকুন্দবাবু স্যার। এইট-বিতে জ্যামিতির ক্লাস নিচ্ছিলেন. জানতে পারলাম যখন উনি কাঠের বড় কম্পাসটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন দরজার গোড়ায়।
মুহূর্তে থেমে গেল সব গোলমাল। গম্ভীরভাবে বললেন, পন্ডিতমশাই একটু ভিতরে আসবো। পণ্ডিতমশাই থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন।
কে শুধু ছাত্ররা কেন শিক্ষকরা পর্যন্ত অন্য এক চোখে দেখতেন। যে চোখের দৃষ্টিতে মিশে আছে শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুটা ভয়ও।
মুকুন্দবাবা স্যার সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন কুন্তলের পিছনে। একটু রাগতভাবে বললেন, এতোদিন ধরে তোমার অত্যাচারের কথা শুনে আসছি--- সে অত্যাচার যে কতোখানি তা আজ নিজে উপলব্ধি করলুম---
তারপর খটাস করে কম্পাসের এক ঘা বসিয়ে দিলেন ওর মাথায়।
এমনিতে শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তবে তিনি যখন রেগে যেতেন তখন তাঁর যে দ্ররূপ পেতো তা শুধুকল্পনা করা যায়। বর্ণনা করা যায় না। বললেন, বইপত্র হাতে নিয়ে নাও....।
কুন্তল চুপ করে বসে রইলো।
আবার বললেন---কি হলো, শুনতে পাচ্ছো না, বইপত্র হাতে নিয়েনাও...।
না নেওয়াটা আর নিরাপদ নয় মনে করে কুন্তল বইপত্র হাতে তুলে নিলো। গোটা ঘরটা তখন থমথম করছে। এই অখন্ডনীরবতার মাঝে কেবল একটানা ফ্যানের আওয়াজ আর মুকুন্দবাবু স্যারের গম্ভীর নির্দেশ।
বললেন, এসো আমার সঙ্গে---স্কুলের ক্লাসমে তোমাকে ঠিক মানায় না----তোমার বাবাকে বলবো, কিছুদিন চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে---তারপর যখন মনে করবে মানুষের পর্যায়ে উঠেছো---তখন স্কুলে এসো---
মুকুন্দবাবু স্যারের পিছন পিছন কুন্তল বেরিয়ে গেলো। ওকে একেবারে গেটের বাইরে বার করে দিয়ে উনি ফিরে গেলেন নিজের ক্লাসে।
এ ঘটনাটা সকলের কাছে একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। স্কুলের দারোয়ান থেকে শু করে হেডমাস্টারমশাই এবং তাঁকে পেরিয়ে কমিটি অবধি। কেননা কুন্তলের বাবা যে এ. ডি. এম.। এ ব্যাপারে অন্যান্য শিক্ষকেরা প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে মুকুন্দবাবু স্যারের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ সমর্থন ছিলো। সেটা প্রমাণিত হতেথাকলো তাঁদের পরোক্ষ কথাবার্তায়। ছেলেদের

মধ্যেও চাপা আলোচনা চলছিল বিষয়টা নিয়ে ভয়ে ভয়ে। কিন্তু যাঁকে ঘিরে এতো কান্ড সেই মুকুন্দবাবু স্যার এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার।
কুন্তল পর পর কদিন স্কুলে এলো না। তারপর যেদিন প্রথম এলো সেদিন তখনো স্কুল বসেনি। যথারীতি বড় গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা জটলা করছি। এমন সময় একখানা মোটর এসে থামলো। নামলো কুন্তল সঙ্গে তার বাবা।
এদিকে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছ খবর পৌঁছে গেছে। তিনি ছুটে এলেন হন্ত দন্ত হয়ে। স্থান কাল ভুলে গিয়ে আমাদের সামনেই বলে বসলেন---এ কি স্যার --- শেষ পর্যন্ত আপনি ছুটে এলেন---
এ. ডি. এম. সায়েব মৃদু হেসে বললেন---- কেন আসতে নেই---
হেডমাস্টার মশাই থতমত খেয়ে বললেন---না-তা নয়-এ সামান্য ব্যাপার-- আসুন ভিতরে আসুন---
----আমি তো মনে করি এটা সামান্য ব্যাপার নয়---
তখনও ওঁর মুখে মৃদু হাসি লেগে।
শুনুতে পেলাম চলতে চলতে। গলার স্বরটা একটু নামিয়ে হেডমাস্টার মশাই বলছেন--- মুকুন্দবাবু একটু ওরকম---ছেলেরা একটু দুষ্টুমি করেই---তাছাড়া পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে রসিকতা তো একটা ট্রাডিশন---আপনি কি বলেন স্যার---আমরা ছেলেবেলায় করিনি---
এর উত্তরে কুন্তলের বাবা কি বললেন তা আর আমরা শুনতে পাইনি। কেননা ততোক্ষণে ওঁরা হেডমাস্টারমশাইয়েরঘরের দিকে এগিয়ে গেছেন। পিছনে কুন্তলও।
আমরা কয়েকজন কৌতুহলী ছেলে হেড স্যারের ঘরের পিছন দিকে চলে গেলাম। জানালার তলায় কান খাড়া করেরাখলাম। মাঝে মাঝে পালা করে আমরা কজনায় জানালাটার একটা ফুটোয় চোখ লাগাই।
পণ্ডিতমশাই এলেন। মুকুন্দবাবু স্যার এলেন। এলেন আরো কয়েকজন শিক্ষক।
মুহূর্তের মধ্যে এ. ডি. এম. এর মুখ ভঙ্গিমার পরিবর্তন হলো। শান্ত ভাবটা মিলিয়ে গেয়ে ভরে উঠলো কঠোরতায়।
প্রচন্ডবেগে কুন্তলের গালে একটা চড় মারলেন। বললেন---মাস্টার মশাইকে তুমি অপমান করেছো---তোমার এতোবড় স্পর্ধা। শীগ্গির পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাও-তারপর ওঁর অনুমতি নিয়ে ক্লাসে যাবে---
বাম হাত দিয়ে গালটা চেপে ধরে কুন্তল সজল চোখে ডান হাতটা পণ্ডিতমশাইয়ের পায়ে রেখে ক্ষমা চাইলো। তারপর গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে গেলো ক্লাস ঘরের দিকে।
ওর বাবা পণ্ডিতমশাইকে ধীর স্বরে বললেন, জানি, ও যা করেছে তাতে ওর ক্ষমা হয় না--- আমি ওর বাবা হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।
পণ্ডিতমশাই বাধা দিয়ে বললেন, না, না, এ কি বলছেন ছি।
তারপর কুন্তলের বাবা মুকুন্দবাবু স্যারকে বললেন---আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ মাস্টারমশাই। আপনি কুন্তলকে আপনার ছাত্র হিসাবেই দেখেছেন--- আমার ছেলে হিসাবে নয়।
ভাবছি সেদিনের সেই ঘটনার কথা। আর আজ শোনা এই ঘটনা। এ দুয়ের মধ্যে কতো আকাশ পাতাল ফারাক।
আজ সেই মুকুন্দবাবু স্যার আছে। ছাত্র আছে আর আছেন ছাত্রর অভিভাবক।
নেই শুধু সেই সময়।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ পরিবর্তন হয়েছে সবকিছুরই। তাই ছাত্রকে মারার অপরাধে আজ তাঁকে পড়তে হবে জেরার মুখে। অভিভাবকের মধ্যস্থতায় করতে হবে ছাত্রর সঙ্গে আপোষ।
ফেরার পথে আনমনে ভাবছিলাম, কাদের কাছে মুকুন্দবাবু স্যার আজ আসামীর কাঠগড়ায়।